ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প: প্রবণতা ও প্রত্যয়

*খাজা মো: ওয়াহিদুর রহমান

Abstract: Akhtaruzzaman Elias(1943-1997) is an influential and most important litterateur of Bangladesh. He wrote only two novels, 28 short stories and one essay. Though he wrote a little but his depth of writings makes him memorable. From the very beginning of his writing career, his stories marked a departure from mainstream literature. Eias avoided cheap sentiment and idealistic concept in his writings. He is considered anti-establishment, non-communal and neo-Marxist writer of Bangladesh. The world he depicts in his stories is full of dark, gloomy and melancholic. We couldn't find any heroic character in his stories. That's why, the characters in his stories live in their success, failure, dreams, repression and desire. He explored an unknown area of human psychology in his stories. However, Elias enriches his writings by using wit, humor, satire and sarcasm against the fragile society. He owned a new style of narrative which added a new dimension in Bangla story. Elias's aesthetic articulation in the short stories made him an eminent stature in Bangla literature. The studies portraits on basic characteristics of Elias's short stories.

বাংলাদেশের ছোটগল্পকারদের মধ্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) বিস্ময়কর ও বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এত নির্মোহ নিরাসক্ত শিল্পদৃষ্টি বাংলা ছোটগল্প জগতে বিরল। তাঁর দৃঢ় শাণিত উচ্চারণ ক্ষয়িষ্ণু সমাজ সংসারের ক্লিশে মূল্যবোধের বৈকল্য ও রুগ্নতাগুলোকে ভেঙে খানখান করে দেয়। ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে তাঁর বেড়ে উঠা। তাই সেইসব ঘটনাপ্রবাহ তাকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর কথাসাহিত্যে উদ্ভাসিত হয়েছে বৃহত্তর জনমানুষের জীবনচিত্র। ছোটগল্প রচনায় তিনি সবচেয়ে বেশি নিরীক্ষা চালিয়েছেন আর সৃষ্টি করেছেন অভাবনীয় কিছু গল্প। বাংলা ছোটগল্প রচনায় তাঁর পূর্বাপর কেউ এত নিবিড় নিরীক্ষা করেন নি। গল্প ভাবনায় তিনি প্রথাগত পথ ছেড়ে একেবারেই ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। ব্যতিক্রমী গল্পভাবনা আর ভাষাবিন্যাসের মুন্সিয়ানায় তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। ভাষা ইলিয়াসের গল্পের প্রধান শক্তি। ইলিয়াসের ছোটগল্প বাঙালি মধ্যবিত্তের গণ্ডি পেরিয়ে প্রসারিত হয়েছে বহুদূর। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনচিত্রণে তিনি নেমে এসেছেন তাদের সমতলে। কথা বলেছেন একেবারে তাদের মত করে। মানুষের জীবনের অন্ধকার , ক্লেদ, বিষাদ, বিকৃতি, সংকট , যন্ত্রণা, বিবমিষার অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণ ইলিয়াসের গল্পের মৌল প্রবণতা। ইলিয়াসের ছোটগল্প বাংলা কথাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গভীর সমাজমনস্কতা আর তীর্যক ভাষাভঙ্গির মাধ্যমে একটি নিজস্ব রচনারীতি নির্মাণ করেছেন, যে রচনারীতি আমাদের বাংলা ভাষাকে ভদ্রলোকের ড্রয়িংরুম থেকে সাধারণের কাতারে নামিয়ে অনন্য এক গতি দিয়েছে-এনেছে নতুন এক মাত্রা। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে অনেকেই অভিনবত্ব দেখিয়েছে, সূচনা করেছেন

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা

নবযুগের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জীবনের অন্ধকারময় জগতকে উন্মোচন করেছেন, শরৎচন্দ্রের চোখে পতিতা-বাঈজীর জীবন ছিল অপার বিস্ময়, কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ চষে বেড়িয়েছেন কয়লাকুঠি, ফুটপাথ, খোলাবস্তি, পরিত্যক্ত ও নিষিদ্ধ এলাকা, কিন্তু কেউই ইলিয়াসের মত এতোটা নির্বিকার থেকে জীবনের এইসব অন্ধকারকে কৃমিকীটের মত সামনে টেনে আনেননি। ইলিয়াসের পৃথিবীর কোথাও আলো পড়েনি-শুধুই অন্ধকার এবং অন্ধকার। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে জন্ম নিয়ে এই শিল্পী আঁতুড়ঘরে বসেই মানুষের বীভৎস চিৎকার শুনেছেন- পাকিস্তানি সামরিক সরাকরের নির্মম শাসন-প্রবঞ্চনা, নিজেদের স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বপ্নভঙ্গের বেদনা তাঁর শিল্পীসত্তাকে শাসিয়েছে। সুদিন, সুসংবাদ- কোন প্রকার শুভাশুভের চর্চা হয় নি বা হবার সুযোগ ঘটে নি ইলিয়াসের শিল্পীসত্তায়, তাই হয়ত তাঁর গল্পে চরিত্ররাও অমার্জিত, অশুভ ও প্রেম-পরিণয় বিবর্জিত প্রথাভাঙা মানুষ। জীবনের ক্লেদ, বিষাদ, অন্ধকার বিবমিষার বাইরে মানুষের কোন জগৎ আছে বলে মনে হয় না।

ইলিয়াসের গল্প পাঠকদের কোন মিথ্যে প্রবঞ্চণা দেয় না। একেবারে টাটকা রক্ত মাংসের মানুষেরা রূঢ় বাস্তবতার দেয়াল বেয়ে তার গল্পে উঠে আসে কিংবা কালেভদ্রে বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে উঁকি দেয় পরাবাস্তব জগতে। কোন আরোপিত আবেগ কিংবা সেন্টিমেন্টকে তিনি তাঁর গল্পে প্রশ্রয় দেন নি। লেখক তাঁর বাস্তবতাকে প্রসারিত করে দিচ্ছেন প্রচলিত দৃষ্টি গ্রাহ্যতার ওপারে। কখনো অতীত এসে ঢুকেছে বর্তমানে, আবার বর্তমানও চলে যাচ্ছে অতীতে-কখনও কখনও আবার কুয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যতেও। বাস্তবতার ডাইমেনশনের এই রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাহিত্যে একেবারে নতুন নয় যদিও, কিন্তু ইলিয়াস যেভাবে দেখেন ও দেখান, তা নতুন।[১] ইলিয়াসের গল্পে কোন নায়ক নেই। কাউকে নায়কের মহিমান্বিত মর্যাদা তিনি দিতে চান নি। তাঁর গল্পের প্রধান চরিত্ররাও দোষ-গুণ, ভাল-মন্দ মিলিয়ে মানুষ। শহুরে কিংবা প্রান্তিক মানুষের সংকট, সংস্কার, যন্ত্রণা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, বিকার, অবদমন অনুপম শিল্পীর মত চিত্রিত করেছেন তাঁর গল্পে।

রাজনীতি সচেতনতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের অন্যতম মৌল প্রবণতা। রাজনীতির প্রতি এত সূক্ষ্ম এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি বাংলা ছোটগল্পকে এক নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ করেছে। ইলিয়াস ছিলেন পুরোদস্তুর শ্রেণিসচেতন লেখক। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের নানা বৈষম্য, পুঁজিবাদের তকতকে ঘা, সাম্রাজ্যবাদের বিধ্বংসী ঢেউ, বুর্জোয়াদের কপট মুখোশ তিনি উন্মোচন করে দিয়েছেন পাঠকের চোখের সামনে।[২] কিন্তু এসব প্রপঞ্চের সমাধানকল্পে তিনি কোন মহান সমাজ ব্যবস্থার রূপকল্প তার গল্পে প্রকাশ করেন নি। সাহিত্যকে তিনি সমাজবিপ্লবের হাতিয়ার মনে করতেন।[৩] তিনি তাঁর গল্পে আমাদের সমাজের নানা ব্যধিকে একেবারে চোখে হাত রেখে দেখিয়েছেন। কিন্তু ব্যধি নিরাময়ের কোন প্রেসক্রিপশন তিনি দেন নি, তা পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থার সামনে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন তিনি এঁকে দিয়েছেন তাঁর গল্পে।

এক পরম আরাধ্য সুন্দরের সাধনা তিনি গল্পে করেন নি। বরং সমাজের তাবৎ অসুন্দর, কুৎসিত, কালো, শ্রীহীন দিক তাঁর গল্পে শিল্পায়িত হয়েছে। ঈশ্বরের শুভাশুভ স্বর্গ তাঁর গল্পে

নাই, আছে শয়তানের প্ররোচনায় স্বর্গচ্যুতি আর নরকবাসের ভয়াবহরূপ! ইলিয়াস এই পঙ্কিল সমাজকে পাল্টাতে চান, সংস্কার কিংবা সংশোধন নয়।

ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণ তত্ত্বের নানা দিক তাঁর গল্পে প্রবলভাবে এসেছে।[৪] যৌনতার আয়নায় তিনি সমাজের প্রতিচ্ছবি দেখতে চেয়েছেন।[৫] বিকারগ্রস্ত সমাজের মানুষের মধ্যে যৌন বিকার ঘটাই স্বাভাবিক। তাই তার গল্পের অনেক চরিত্রের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় অবদমিত যৌনচেতনা আর যৌনবিকার। ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণের মাধ্যমে তিনি গল্পের চরিত্রের একেবারে গভীরতম প্রদেশে ঢুকে দেখিয়াছেন লিবিডোর তাড়না, উন্মোচিত করেছেন অদস, অহম, অধিশাস্তা, যৌনবিকার, অবদমিত বাসনা।

কুকুরে-মানুষে মিলেমিশে যৌনসুখ উপভোগ, পুরুষে পুরুষে যৌনক্রিয়া, মা-সন্তানের যৌনসুখ শেয়ার, মৃত পিতার উপরে পুত্রের প্রতিশোধ-জীবনের এই কোন চেহারা?[৬] *উৎসব* গল্পের কুকুরের যৌনিক্রিয়ার সুখ, *যুগলবন্দী* গল্পের অভিজাত কুকুরের পায়খানার সুখ মানুষের শরীরে চালান করে বিষে বিষ ক্ষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা চালিয়েছেন। *তারাবিবির মরদ পোলা* গল্পে যে বীভৎসতা-যৌনসুখ বঞ্চিতা তারাবিবি তার অতৃপ্তিজনিত উগ্রতা পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে চালান করে দিয়ে যে বিকৃত সুখ পেতে চায়, তাকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন, ইলিয়াস মূলত কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেয়েছেন। অবরুদ্ধ চেতনার প্রকাশের এই আগ্রাসন বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন দৃষ্টান্ত। নির্জন দুপুরে কাজের মেয়ের সাথে ছেলের শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে বাবা প্রতিবাদ করলে মা তারাবিবি ছেলের পক্ষ নিয়ে বলে -

> পোলায় আমার জুয়ান মরদ একখান? তুমি বুইড়া মরাটা, হান্দাইয়া গেছো কব্বরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা ক্যামনে?[৭]

তারাবিবি তার ছেলের অনৈতিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে বীভৎস শোধ নিল। দুর্জ্ঞেয় রহস্যের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা মনোবিকারগ্রস্থ এই নারীর সত্যমূর্তি সমাজ ও রুচির বিচারে যতই বীভৎস ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হোক না কেন, বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অদম্য যৌন চেতনার এই বিকৃতরূপ আমরা ভদ্রজনেরা কৃত্রিম ভদ্রতার ছদ্মাবরণে ঢেকে রাখলেও, তারবিবি তা করে নি। স্বামীর যৌন অক্ষমতার কারণে ছেলের মধ্যে বহুগামীতা এবং যৌন জীবনে সাহসী পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ করে সে এক ধরণের বিকৃত সুখ পেতে চায়। পুঁজিবাদীসমাজ ব্যবস্থায় যৌনবৈষম্যের শিকার তারাবিবি। প্রচলিত আর্থ-সমাজ ব্যবস্থা ও পারিবারিক বিন্যাসের বিরুদ্ধেই তারাবিবির ক্ষোভ বা বিদ্রোহ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে এত বিচিত্র খিস্তিখেউরে গালিগালাজ আছে, যা পাঠকের শুদ্ধ সাহিত্য সংস্কারে আঘাত হানতে বাধ্য। বাংলা সাহিত্যে ইলিয়াসের গল্পের মত এত গালিগালাজ আর কেই আওড়ায় নি। গালি অক্ষমের সান্ত্বনা, একধরনের প্রতিবাদও বটে। ইলিয়াসের গল্পের চরিত্রগুলোর মুখ থেকে গালিগুলোকে কেড়ে নিলে প্রত্যেকটি চরিত্রের অপমৃত্যু ঘটবে, সেই সাথে আনোয়ার আলি, তারাবিবি, রমজান আলি, ওসমান, সমরজিত,

অমৃতলাল, আফতাব মৌলবী, আব্বাস পাগলা, ইমামুদ্দিন, আসগর-এরা কেউ-ই আর পরিপূর্ণ মানুষ থাকবে না। ইলিয়াসের গল্পে গালিগালাজকারীদের দুইটি শ্রেণিতে ধরে আলোচনা করা যায়। একটি শ্রেণিতে আছে সমাজের অক্ষম দুর্বল প্রান্তিক মানুষ, যাদের কাছে শক্তিমানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রশমনের অন্যতম হাতিয়ার এই গালি। আরেকটি শ্রেণি হল পুরান ঢাকার কুট্টি শ্রেণির মানুষ। গালি যাদের সাবলিল ভাব প্রকাশের সহায়ক। আবেগের তীব্রতার কিংবা ভাবপ্রকাশের উচ্ছ্বাসে তারা অবলিলায় গালিগালাজ করে, যা আমাদের ভদ্র মধ্যবিত্ত সংস্কার বেঢপ বেমানান হিসেবে চিহ্নিত করে। *ফেরারী* গল্পে জ্যোৎস্নাশোভিত অতিপ্রাকৃত রাতে ইব্রাহিম ওস্তাগর অপরূপ সুন্দরী এক পরীর রূপ বর্ণনা আবেগের উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করেছেন এভাবে-

> মনে লয় চান্দের রোশনি হালায় পায়ের মইদ্যে না হান্দাইয়া পইড়া অহন আর বারাইবার পারতাছেনা।[৮]

উৎসব গল্পে হোটেল মালিক তোতা মিয়া দুপুর রাতে তার কর্মচারীকে তাড়া লাগায় এই বলে-

> আব্বে চুতমারানী, এহেনে খাড়াইয়া কিয়ের রং দ্যাহো? রাইত বাজে একটা, আর তুমি হালায় খানকির বাচ্চা এহেনে রংবাজি করো? তোমার কোন বাপে গিয়া কাউলকা দোকান খুলবো?[৯]

সংলাপ- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের বিশেষ শক্তির জায়গা। ইলিয়াসের গল্পে চরিত্ররা কথা বলে একেবারে সহজ সাবলীল আটপৌরে ভঙ্গিতে। তাই পুরান ঢাকার কিংবা গ্রামীণ চরিত্রদের কথায় থাকে অসংখ্য খিস্তিখেউড়ে। ভাষা ব্যবহারে তিনি কোন ছুতমার্গের আশ্রয় নেন নি। তিনি নিজে কোন জাত কুলের ধার ধারতেন না, তাই তার ভাষাও কুল মান রক্ষা করে চলে নি। সমাজব্যবস্থায় তিনি যেমন কোন ব্রাহ্মবাদ মানতেন না, ভাষা বিন্যাসেও তিনি কোন কুলীন লেখক হতে চাননি। তাইতো সমাজের ব্রাত্যজনের কথাও তিনি বলেছেন ঠিক তাদের মত করেই। ইলিয়াসের গল্পের ব্রাত্যজনেরা তাদের মত করেই খিস্তি করে আর অবলিলায় কথা বলে আঞ্চলিক উপভাষায়। বাংলা গল্প নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছিল কালোপযোগী স্বতন্ত্র ভাবনা।[১০] গল্পের শরীর নির্মাণে তিনি সনাতন পথে হাঁটেন নি, একবারে অভিনব নিজস্ব একটি পথ তিনি বেছে নিয়েছেন। তাঁর স্বাভাবিক গদ্যরীতি ব্যঙ্গ ও কৌতুকপ্রবণ। গল্পের বয়ানেও আছে নিজস্বতার ছাপ। উইট আর স্যাটায়ার ব্যবহার তাঁর গল্পকে করেছে ঋদ্ধ। তাঁর গল্পের তেজস্ক্রিয়তা তাই মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে পাঠকের মননে।

মৃত্যুচেতনা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর অনেক গল্পেই মৃত্যুর কথা এসেছে। মৃত্যুকে তিনি এক ভিন্নমাত্রার দর্শন চিন্তার স্তরে পৌছে দিয়েছেন। মৃত্যু নিয়ে এমন অভিনব চিত্রভাষ্য সত্যি ব্যতিক্রম।[১১]

ইলিয়াসের গল্পে লোকজ মিথ নবজন্ম লাভ করেছে। মিথের ভাষা নির্মাণে তিনি অন্যদের মত ভারতীয় কিংবা গ্রীক মিথকে অনুসরণ করেননি। মিথের কাহিনিসূত্র তিনি অনুসন্ধান করেছেন লোকজ সমাজবিন্যাসের মাঝেই। তাই তাঁর মিথ হয়েছে লোকজ ঐতিহ্যের অনুসারী। প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রান্তিক মিথের ব্যবহার তাঁর গল্পকে তৃণমূলে যাবার পথ দেখায়। *ফেরারী* গল্পের ইব্রাহিম ওস্তাগরের রাতের বর্ণনা আমাদের এক অতিপ্রাকৃত জগতে নিয়ে যায়-

> এখনো চাঁদনী রাত হলেই একজোড়া পায়ের পাতায় বন্দী জ্যোৎস্না দেখার লোভে ঘুমের মধ্যে হেঁটে হেঁটে সে ভিক্টোরিয়া পার্কে চলে আসে।[১২]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে ডিটেলের ব্যবহার এত ব্যাপক ও সূক্ষ্ম যে, কোন ক্ষুদ্র একটি জিনিসও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকে না। এত সূক্ষ্ম ও গভীর অনুপুঙ্খ শিল্পদৃষ্টি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মত শক্তিমান গল্পলেখকের পক্ষেই সম্ভব। তিনি যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর গভীরতা অনুসন্ধান করেছেন। শুধু চারপাশের পরিবেশের নিখুঁত বর্ণনা নয়, ইলিয়াসের চোখ থেকে কোন চরিত্রের বিন্দুবিসর্গও বাদ পড়ে না। পুরান ঢাকার অন্ধকারময় অলি গলিও তাঁর গল্পে একবারে দিনের আলোর মত আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পে পুরান ঢাকার গলি উপগলির বর্ণনা এরকম-

> কয়েক ধাপ গিয়ে বাঁয়ে কান্দুপট্টির ভিতরে কোনমতে পিছলে পড়তে পারলে খানকিপাড়ায় অজস্র গলি উপগলি শাখাগলি, ঘরের ভেতর দিয়ে ঘর পেরিয়ে ঘন বস্তিটা পেরোলেই ইংলিশ রোড, রাস্তাটা ক্রস করে একটু ভেতরে ঢুকতে পারলে নাজির আলির নতুন দখল করা লন্ড্রি, লন্ড্রির একমাত্র কর্মচারী লালমিয়া রাত্রে তখন লন্ডিতেই থাকে।[১৩]

কেবল পরিবেশের ডিটেল নয়, চরিত্রের ডিটেল। পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় জ্যোতিরিন্দ্রি নন্দী বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বিকার ভঙ্গির বর্ণনা। পরিবেশ আর চরিত্রের রূপায়ণে ইলিয়াসের গল্পে ডিটেলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬)-এর নাম গল্পেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। গল্পটি রচিত হয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে। গল্পের পটভূমি ঢাকার অদূরে অবস্থিত নারায়নগঞ্জ শহর। আধাঘন্টা হাঁটলে যে শহরকে এমাথা ওমাথা ফালা ফালা করা যায়। যে অপার স্বপ্ন সম্ভাবনা নিয়ে একটি শোষণ বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়, সে স্বপ্ন ভাঙতে শুরু করে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরপরই। স্বপ্নভঙ্গই যেন আমাদের নিয়তি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এ স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের চিত্র রূপায়ণ করেছেন এ গল্পে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিদারুণ বেদনাও প্রতিভাসিত হয়েছে গল্পটিতে।

কলকাতা থেকে আগত প্রদীপ বাংলাদেশে এসে তার পিসতুতো ভাই ননীদার বাড়িতে বেড়াতে এসে যে নিদারুণ অভিজ্ঞতার স্বীকার হয় তার অনন্য বয়ান *অন্য ঘরে অন্য স্বর*

গল্পটি। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের কিছু হিন্দু পরিবার নানা বঞ্চনা স্বীকার করে শেকড়ের টানে ভিটা মাটিতেই থেকে যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রাম তাদের একটি আশার আলো দেখিয়াছিল। কিন্তু সে আলো ম্রিয়মান হতে খুব বেশি সময় নেয় না। স্বাধীনতার পরও রাজনীতির নামে যে অরাজনৈতিক, অনৈতিক কর্মকাণ্ড চলেছে ননীদা তার শিকার। ক্ষমতাসীন দলের নামে গজিয়ে উঠে সুবিধাবাদী নানা উপনেতা পাতিনেতা। যারা সম্মেলন, সমাবেশ, কনফারেন্স, মিটিং-এর চাঁদার নামে হয়রানি করে সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীদের। এমনই একটি পরিবার ননীদার পরিবার। যারা শত কষ্ট সত্ত্বেও দেশ ছেড়ে অন্যদের মত কলকাতায় চলে যায় নি। কিন্তু কামাল ভাইদের মত গজিয়ে উঠা নতুন নেতাদের তাণ্ডবে তারা অতিষ্ট। রাতে ননীদার ঘরে বৌদির কাছে জানা যায়-ননীদার মেয়ে ইন্দিরা এলাকার বখাটে ছেলেদের জন্য কলেজে যেতে পারে না। ননীদার ইন্টারমিডিয়েট পড়ুয়া ছেলে অমিতের ঘরে প্রদীপের শোবার ব্যবস্থা হয়। অমিতের বিছানার নিচে খুঁজে পাওয়া একটি পর্ণোগ্রাফিক বই প্রদীপের রিরংসার দরজার কড়া নাড়ে। কিন্তু কিছুসময় পরেই ফ্রয়েড কথিত লিবিডোর তাড়না থেকে তার মুক্তি মেলে। পুরনো দালান ঘরে প্রদীপের পাশের ঘরেই থাকে পুরনো দিনে স্মৃতিহাতড়ে বেড়ানো মানুষ তার পিসিমা। এ গল্পে উজ্জ্বলতর করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে ক্রমশ পরিবর্তনমান জীবনের ভেতর বেঁচে থাকা পূর্বপ্রজন্মের এই পিসিমাকে, যিনি সমকালের জীবন-প্রতিবেশে বাহুল্য, বাতিল হয়ে গেছেন, কিন্তু বেঁচে আছেন পূর্ববর্তী নানা ঘটনা-অনুভূতির সাক্ষী হয়ে। মৃত বড় ভাইয়ের দেশপ্রীতি, স্নেহপ্রবণতা, পুরনো স্মৃতি আর পূজা-কৃষ্ণকীর্তন নিয়ে বিধবা পিসিমা বাড়ির পুরনো দালানে পড়ে থাকেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। তার গহীন হৃদয়ের অস্ফুটকথা অনুরণিত হয় অন্য ঘরে অন্য স্বর হয়ে।[১৪] অস্তিত্বের সংকটে বিপর্যস্ত, ক্ষয়ে যাওয়া ননীদার সংসারে পিসিমা সত্যিই এক সেকেলে স্বর। প্রদীপের সঙ্গে কথোপকথনে বারবার চলে আসে মৃত বড় ভাই অর্থাৎ প্রদীপের বাবা, তার সংগত কারণও খুঁজে পাওয়া যায়। বিধবা হয়ে যাওয়ার পর ছেলেসন্তানসহ বোনকে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন তিনি। পিসীমার ভাষ্য:

> আমার কপাল পুড়ছে পর দাদায় মাছ ছাড়লো। কত কইছি, হুনছেনা।[১৫]

বাড়ি ছেড়ে, দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না তিনি। ক্যানসারের জন্য তাকে জোর করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পিসিমা জীবনযাপনে, মানসিকতায় তারই উত্তরসূরি। যুদ্ধের সময় সবাই আগরতলা পালিয়ে গেলেও পিসিমা যাননি।

> বাবায় দ্যাহ রাখছে. আমার বয়স তহন সাত আট বছর, দাদায়তো আমাগো বাপ হইছে।[১৬]

পিসীমার কী সরল স্বীকারোক্তি! মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে বিকাশমান জনজীবন ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ও শিথিল সম্পর্কের মধ্যে তাদের সেই নিবিড় নির্ভরতা-আন্তরিকতা-ভালোবাসার সম্পর্কের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া সে প্রজন্মের পিসীমাদের আর কোন অবলম্বন নেই-এ কথা ইলিয়াস অত্যন্ত মমতা নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন।

দুধে ভাতে উৎপাত গল্পটিতে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ক্ষুধাপীড়িত, বঞ্চিত, অসহায়, মানুষের আর্তনাদ চিত্রায়িত হয়েছে। গ্রামীণ সমাজ প্রতিবেশে নব্য সামন্তশ্রেণির উদ্ভবে শোষণ-নিষ্পেষণ, অন্যদিকে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের অসহায়ত্ব, শৃঙ্খল, বঞ্চনার এক মর্মন্তুদ কাহিনী ও গল্পটি। অহিদুল্লার পুরো পরিবারের ক্ষুধার যন্ত্রণা, মুমূর্ষু জয়নাবের সন্তানদের নিয়ে শেষবাবের মত দুধভাত খাওয়ার বাসনা, জোতদারের নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি এ গল্পে এক নিরাসক্ত শিল্পীর মত তুলে ধরেছেন গল্পকার। ধলেশ্বরী নদীর তীরের অহিদুল্লা নামের এক কিশোরের চোখ দিয়ে গল্পের ঘটনাগুলোকে দেখা হয়েছে। অহিদুল্লার বাবা মৌলবি কসিমুদ্দিনের দাম বোঝার মতো লোক নেই তিস্তাতীরের খোলামহাটি গ্রামে। নিজের দাম বাড়াতে কাসিমুদ্দিনেব তাই আক্ষেপ-

> যেখানে তিন দিন বৃষ্টি হলো তো ডাঙ্গা নদীর কোন ভেদচিহ্ন রইলো না, সেখানে মানুষ বাস করে?[১৭]

কোরবানির ঈদের পর মংস-কলিজা নিয়ে একবার এবং বছরে আর দু-একবার ছাড়া এখানে তাকে দেখা যায় না। যে কয়দিন সে বাড়িতে থাকে সে কয়েদিন তাদের দরিদ্র ঘরে যেন উৎসব নেমে আসে। এছাড়া পাঁচ পাঁচটি সন্তান উৎপাদন করলেও তাদের প্রতি কোন দায়িত্ববোধ তার মধ্যে দেখা যায় না। অহিদুল্লার মা জয়নাবের মাধ্যমে বাঙালি নারীদের অনিঃশেষ মমতা ফুটে উঠেছে। জয়নাবের মৃত্যুশয্যায় এক নিদারুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তার সন্তানসহ সবাই তার শয্যাপাশে। জয়নাবের শেষ ইচ্ছা দুধভাত মেখে সন্তানদের খাওয়াবে। এককালে জয়নাবের ছিল কালো গাই, দুধভাতসহ স্বাচ্ছন্দ্য জীবন। তখন দেড় সের চালে ভেজানো হতো এক পোয়া দুধ, মেশানো হতো কলা, কোমল হাতে মেখে চলতো ধুম করে খাওয়ার মহরত। মুমূর্ষু অবস্থায় জয়নাবের সে স্মৃতি অমলিন। আজ সে কালো গাই বন্ধক রাখা হয়েছে মৃধার নিকট। হারুন মৃধা বড় মুদি দোকানদার। দোকান থেকে নেওয়া চালের অর্থ বাবদ দুধেল গাই এখন হারুন মৃধার আয়ত্তে। জয়নাবের শেষ কথা রক্ষার্থে ওহিদুল্লাহকে পাঠানো হয় হারুন মৃধা তথা হাশমত মুহুরীর বাড়িতে । হাশমত মুহুরীর শহুরে চাকুরিজীবী ছেলে আলতাফ অনেকদিন পর সন্তান সন্ততি নিয়ে গ্রামে এসেছে। সেখানে চলছে দুধের পায়েসসহ নানাবিধ খাবারের আয়েজন। ওহিদুল্লার মিনতি হাশমত মুহুরীর বাড়ির মানুষকে সামান্য কাতরও করে না। মুমূর্ষু মায়ের শেষ ইচ্ছার কথা করুণ স্বরে জানালে হারুণ মৃধা তীব্র স্বরে উচ্চারণ করে: 'তর মায়ে-বুইড়া মাগীটার ঢঙের হইছে দুধভাত খাইবো।' ইলিয়াস চমৎকারভাবে তুলে করেছেন সেই সময়ের পরিস্থিতি-

> শহরের পয়দা মেয়েটি পেয়ারা কামড়ানো স্থগিত রেখে বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, নেই কোন উৎপাত, খাই শুধু দুধভাত ।'[১৮]

শেষাবধি জয়নাবের বড় জা হামিদা শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য চালের গুঁড়া জ্বাল দিয়ে আনে। হামিদা বিবির সানকির দিকে তাকিয়ে থাকে ওহিদুল্লা, আহম্মদউল্লা, খাদিজাসহ বুভুক্ষু সবাই। ক্ষুধার করাল গ্রাসের কাছে মায়ের মৃত্যুও গৌণ হয়ে যায়। ভাতের গন্ধ এদের

পেটের আয়তন দ্বিগুণ করে। এই গল্পের শেষে ইলিয়াস এক রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন। মায়ের নিষ্পাপ হাতের তুলে দেয়া ভাতের গ্রাস বসন্তের দাগ ভরা মুখে হাজেরা খেয়ে ফেললে ওহিদুল্লা ভাবে,

> বেতমিজ আওরাৎ! মেয়েমানুষের বুদ্ধি মানে ইবলিসের উস্কানি।[১৯]

এখানে ভাইবোনের পরস্পরের প্রতি আলাদা কোন স্নেহ-মমতা ভালোবাসার উপস্থিতি নেই। এরা চেনে ভাত; দুধভাত আর চালের গুঁড়া মেশানো ভাতের পার্থক্য এরা বোঝে না। 'পোলাপানরে তুমি কি খাওয়াইলা?'- জয়নব বিবির এ প্রশ্নের জাবারে হামিদা বিবি যখন বলে, 'ক্যান বৌ? চাইলের গুঁড়ি পোলাপাইনরে কোনদিন খাওয়াস নাই? দুধ দিছ কয়দিন? দুধের স্বাদ তোর পোলাপাইন জানে কি?' তখন বুঝতে পারি, কেন এদের জীবনে নানা সম্পর্কের ভেতর ভাতই মুখ্য। বিছানার প্রান্তে পড়ে যাওয়া 'দুধভাত' মাখা হাত 'স্তনেরমত' যখন খাদিজা চুষতে থাকে, তখন তাকে আর মানুষ বলেই চেনা যায় না। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষের ক্ষুধার কথা নানাভাবে এসেছে বাংলা সাহিত্যে, কিন্তু নিরন্ন মানুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার এ রকম প্রতিক্রিয়া বাংলা সাহিত্যের পাঠক এর আগে তেমন লক্ষ করেনি।

জয়নাব বিবির বমির কাছে পড়ে থাকা সানকির ওপর একঝাঁক পশুর মতো পাঁচটি ছেলেমেয়ে হুমড়ি খেয়ে যে দৃশ্যের সৃষ্টি করে, তা আমাদের কাছে ভয়ংকর-অসহ্য-অস্বাভাবিক ঠেকে। এতটা যেন হয় না, এ যেন অভিজ্ঞতার বাইরে বা অবাস্তব। আমরা যা কিছুকে মানবিক বলতে শিখেছি, তার কিছুই এদের জীবনে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এরা যে পরস্পরের ভাইবোন, লেখক উল্লেখ না করলে তা সনাক্ত করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ত। মানুষের ক্ষুধা এবং ক্ষুর্ধাত মানুষের চরিত্রের গতিপ্রকৃতির নগ্নরূপ আরও নগ্ন ও বীভৎসরূপে উপস্থাপন করানোর জন্যই যেন ইলিয়াস সংকল্পবদ্ধ হয়ে ব্যাপারটিকে এমন ভয়ংকর ও অস্বস্তিকর করে তুলেছেন। কিন্তু অভিনিবেশ করলে এই অস্বস্তির কারণ স্পষ্ট হতে থাকে। আসলে ক্ষুধা ও ক্ষুর্ধাত মানুষ সম্পর্কে ধারণা থাকলেও বাংলাদেশের গ্রামসমাজে বঞ্চিত মানুষের প্রকৃত অবস্থা যেমন আমরা জানি না, তেমনি এ অবস্থায় মানুষ কতটা বিচিত্র ও মানবেতর আচরণ করতে পারে-তাও আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। ফলত, এ ধরণের ভয়নাক দৃশ্যের মুখোমুখি হলে একটু অস্বস্তি বোধ না করে পারা যায় না। এ রকম নির্মোহ পর্যবেক্ষণ ও নির্মম উপস্থাপন ইলিয়াসের স্বেচ্ছাকৃত। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, তিনি দর্শকমাত্র, অংশগ্রহণকারী নন। কিন্তু যাদের দেখাচ্ছেন, তাদের বিস্ময়ে-বেদনায়-অস্বস্তিতে হতবাক হতে হবে। মরতে মরতে জয়নব ওহিদুল্লাকে বলে-

> বুইড়া মরদটা। কী দ্যাহস? গোরু লইয়া যায়, খাড়াইয়া খাড়াইয়া কী দ্যাহস।[২০]

জয়নাব বিবির মৃত্যুমুহূর্তে লেখকের সমাপ্তিবাক্য তাৎপর্যপূর্ণ:

> এত বমির পর নির্ভার মায়ে মুখের যে কঠিন চেহারা হয়েছে তাতে তার হুকুম তামিল না করে ওহিদুল্লার কি রেহাই আছে?[২১]

এই ইঙ্গিতপূর্ণ সমাপ্তিতে আমরা বুঝতে পারি, বমির ভেতর দিয়ে সমগ্র জীবনকে উগরে দিয়ে জয়নাব বিবি মারা যায় বটে, কিন্তু সে প্রবল শত্রু হিসেবে শনাক্ত করে যায় হাসমত মুহুরি, তার মেয়ে জামাই হারুন মৃধা ও তার ছেলে ঢ্যাঙা আশরাফকে। গ্রামের বিত্তবান মানুষ সামান্য অর্থের বিনিময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তাদের নি:স্ব করে টাকার পাহাড় গড়ে। এদের বিরুদ্ধে জয়নাব বিবির মৃত্যুকালীন বাক্যটিকে লেখক সমস্ত জনতার উদ্দেশ্যেই ছুড়ে দেন।

শ্রেণিদ্বন্দ্ব, ব্যাপক ধনবৈষম্য, নগরায়ণের করাল গ্রাস, গ্রামে নব্যসামন্ত শ্রেণির আবির্ভাব এবং প্রান্তিক মানুষের নিঃস্ব অবস্থার শিল্পরূপ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'পায়ের নীচে জল' গল্পটি। আতিকের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের নানা প্রবণতাকে ধারণ করেছেন লেখক । গল্পটিতে আতিকের বাবা শহর আর গ্রামের মধ্যে শেষ সম্পর্কের সুতো হিসেবে চিহ্নিত হয়, যে সুতোটি আতিকের প্রজন্মে এসে ছিন্ন হয়ে যায়। আর কিসমত সাকিদারের মত মানুষেরা নতুন পুঁজির ছোবলে শেষ সম্বলটুকুও হারিয়ে একেবারে নি:স্ব হয়ে যায়। অন্যদিকে আলতাফ মৌলবির মত এক ধরণের মুৎসুদ্দির উদ্ভব হয়- যাদের মূল লক্ষ্য যে কোন মূল্যে সম্পদ অর্জন। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আতিক এ গল্পে শহুরে উঠতি পেটি বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। আতলাফ মৌলবি গ্রামের উঠতি সামন্ত শ্রেণির কম্প্রেডর চরিত্র, যার কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও বেশিরভাগ কৃষিজমি তার কব্জায়। কিসমত সাকিদার পুঁজিরআগ্রাসনে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া প্রলেতারিয়েত কৃষক। আতিকের বাবার মতো সেও আলতাফ মৌলবিকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু জমি বিক্রয়ের ব্যাপারে নির্ভর করে আলতাফের ওপরই। তাদের বর্গাচাষি কিসমত সাকিদারের ভাঙা গলার ডাকে সে ভয় পায়, 'জমির বর্গাচাষীর দল কি এসে পড়লো।'- এ ভয়ের জন্য আবার সে লজ্জাও পায়। উঠোনে কিসমতের বড় ছেলের বউয়ের পাশে কিসমতের বউ গিয়ে উপস্থিত হলে সে ভাবে, 'ওরা কি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে?' -আবার তার বাবার সঙ্গে কিসমত সাকিদারের সম্পর্ক ভালো ছিল, ফলে সে জমি বিক্রি করে দেবার কথা তুলতেই পারে না। সন্দেহ-অবিশ্বাসের সঙ্গে সংকোচ তার ভেতরে একইসঙ্গে উপস্থিত হয়। ফলে সে স্বাভাবিকভাবেই আলতাফ মৌলবির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তাদের বর্গাচাষি কিসমত এখনো জ্যোৎস্না রাতে আর মৃত বাবাকে 'মাচার উপর বসে খালি ঝিমা'তে দেখলে আরেকটি জ্যোৎস্না রাত আসার ভয়ে দিন থাকতে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। এখানে একটি বিষয় চমৎকার মাত্রিকতা পেয়েছে তা হলো বাঁধ ভাঙার শঙ্কা। বাঁধের উপর শ্রমজীবী ও সর্বহারাদের পাল্লা ভারী হতে থাকে।''আলতাফ মৌলবি বলে, 'আতিক শুনছো, নদী দৌড়ায়।' তার মানে এই বাঁধে আরো লোক আসছে। এরপর উঠে আসছে কিসমত আর আকালু আর কিসমতের বউ কিসমতরে বড় ছেলে আর বড় ছেলের বউ আর কিসমতরে নাতি আর কিসমতের পঙ্গু ছেলে আসমত আর-। এদের ধ্যাবড়া পায়ের কাণ্ডজ্ঞানহীন চলাচলে বাঁধের ফাটলে চিড় ধরবে, চিড় পরিণত হবে মস্ত মস্ত হাঁ-তে।''[২২]বাঁধভাঙ্গার ভয়ে আতিক পালিয়ে গেলেও বাঁধের উপর শ্রমজীবী ও সর্বহারা

মানুষের অবস্থান ব্যাপক হয়ে উঠে। এখানে গল্প প্রতীকীরূপ পায়। বাঁধভাঙ্গার প্রতীকটি গণজোয়ারে সমাজ কাঠামোর প্রবল অবস্থানটি ভাঙার ইঙ্গিতই বহন করে। এখানেই লেখক উদ্বাস্তু মানুষের স্বপক্ষে এক মানবিক স্বপ্নের বিভ্রম তৈরি করেন।

জমি বিক্রি করে গ্রামে থেকে টাকা নেওয়ার জন্য দুই বড় ভাইয়ের চাপ, আলতাফ মৌলবির বিরক্তিকর চরিত্র, কিসমতের মুখে নিজের মৃত বাবার স্মৃতি বর্ণনা, কিসমতের বাত-ব্যাধিগ্রস্থ সন্তানের বিলাপ, বড় ছেলের কানা বউয়ের এক চোখের ঝকঝকে দৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যই আতিক জমি বিক্রির পুরো দায়িত্ব আলতাফ মৌলবির উপর ছেড়ে দিয়ে দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হয়।

আতিক আসলে কিসমতদের দেখে একটা সমবেত অবস্থার ভেতর, আলতাফ মৌলবির বিরুদ্ধে কিসমতের ছেলে আকালুর ক্ষোভ প্রকাশের মধ্য দিয়ে মূলত উদ্বাস্তু কৃষাণদের ক্ষোভই ঝরে পড়ে। আতিকের ভয়ের মধ্য দিয়ে তার মধ্যবিত্ত মানসিকতাই কেবল স্পষ্ট হয়নি, লেখক বিত্তহীন শ্রেণির একটি সংঘবদ্ধতার ইঙ্গিতও দিয়ে যান।

সিঙ্গাইর গ্রামের যুবক রমিজের চোখ দিয়ে শহর আর গ্রামের দ্বৈথ অন্ধাকারের রূপায়ণ ঘটেছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *কীটনাশকের কীর্তি* গল্পে । শহর আর গ্রামের সমাজবিন্যাসের ম্যাকানিজম তিনি দেখিয়েছেন শ্রেণিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে।

এই গল্পে আমরা দেখি, নিরক্ষর রমিজ আলি সুখের সন্ধানে ধলেশ্বরীর তীর থেকে রাজধানীতে এসে বিত্তবান এক মানুষের বাড়িতে কাজ নিয়েছে। একদিন বাবার চিঠিতে, যে বুবুর সাথে ছোটবেলার নানা স্মৃতি জড়িত, তার আত্মহত্যার খবর জেনে দ্রুত বাড়ি যাওয়ার জন্য সাহেবের কাছে টাকা চাইতে যায় সে। কিন্তু সাহেবের কাছে টাকা চাওয়ার পরিবেশ সে তৈরি করতে পারেনা। এদিকে বোনের মৃত্যুর জন্য স্বামী হাফিজুদ্দিন ও জোতদারের ম্যাট্রিক পাস ছেলে, যার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে বোন বিয়ের আগেই গর্ভবতী হয়েছিল, তাকে বোনের মৃর্ত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করে সে-এদের প্রতি রাগ এবং সাহেবের কাছে বাড়ির অবস্থা বর্ণনা করে টাকা চাইতে না পারা-সব মিলিয়ে তার মধ্যে মনোবিকার উপস্থিত হলে সে সাহেবের মেয়েকেই বিষ খাইয়ে মারতে যায়। সাহেবের মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করার অপচেষ্টার অপরাধে বেধড়ক মার খেয়ে সে সারা রাত গ্যারেজে বন্দী থাকে এবং ভোরের দিকে মারা যায়।

ইলিয়াস রমিজ আলীর ভেতর দিয়ে একাধারে গ্রাম ও শহরকে দেখেছেন, গ্রামে রমিজের পরিবারের শোচনীয় অবস্থাকে তুলে এনেছেন; তার মা, বুবু, হাফিজুদ্দি, গ্রামের 'ম্যাট্রিক পাস' ছেলে, সাহেবের মেয়ে, বউ, সাহেবের ট্রাকের ড্রাইভার-প্রত্যেকের চরিত্র স্পষ্ট করেছেন। যে জোতদারের বাড়িতে গ্রামের মানুষ কামলা খাটে, তাকে যে শুধু সর্বশেষ ভূমিটুকু দিতে হয় তা নয়, দিতে হয় নারীর সম্ভ্রমও। যে বাড়িতে রমিজের মা বোন কাজ

করতো, তাদেরই 'ম্যাট্রিক পাশ' ছেলে, গল্পে যার নাম নেই, তার লোভের শিকার হয় বুবু অসিমুন্নেসা। সে অসিমুন্নেসার চোখে স্বপ্ন আর গর্ভে সন্তান দিয়ে অন্তর্হিত হয়। নিজের দোকানের কর্মচারী হাফিজুদ্দির সঙ্গে বিয়ের পর হাফিজুদ্দিকে ঢাকায় পাঠিয়ে সে অসিমুন্নেসার দরজায় টোকা দেয়। তার হাত থেকে বাঁচার জন্য অসিমুন্নেসা বাপের বাড়ি চলে এলে সে ফতোয়া দিয়ে বেড়ায়:

> চাকর বলে কি হাফিজুদ্দি মানুষ নয়? তার কি আখেরাত নাই? বিয়ের অগে যে মেয়ে পেট বাঁধিয়ে বসে তার সঙ্গে সে হাফিজুদ্দিকে ঘর করতে বলে কোন বিবেচনায়?[২৩]

এখানে 'ম্যাট্রিক পাশ' শিক্ষিত লোক, যার রয়েছে জমিজমা, হালের গরু, কিষাণপাট, সিঙাইরে মনিহারির দোকান, পাটের আড়ত-সে কেবল অসিমুন্নেসারই সম্ভ্রম নষ্ট করেনি, তার ঘর ভাঙ্গার ব্যবস্থা করে তাকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে।

কিন্তু এই মৃত্যুর জন্য বাবার শোকের অবকাশ নেই। কারণ, এরপরে যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তা-ই হয়ে ওঠে বিবেচনা ও দুশ্চিন্তার বিষয়। অসিমুন্নেসার আত্মহত্যার খবর রমিজকে জানাতে গিয়ে বাবা একথা লিখতে ভোলে না যে, 'দারোগা পুলিশে একুনে ৩ টাকা কম ২৫০ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।' যে আসমত আলীর জমি সে চাষ করে, সে তার পাওনা টাকার জন্য পুলিশ দিয়ে বেইজ্জত করবে বলে শাসাচ্ছে । এ অবস্থায় ওই মৃত্যু তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি, যে ম্যাট্রিক পাশের জন্য অসিমুন্নেসাকে মরতে হয়, পুলিশ তার কিছুই করে না; আর অসিমুন্নেসা মরেও তার বাবাকে রক্ষা করতে পারে না পুলিশের হাত থেকে। আধা সামন্ত আধা পুঁজিবাদি ব্যবস্থায় পুলিশ ও যাবতীয় প্রশাসন জোতদার শ্রেণির জন্যই সংরক্ষিত।

পুরান ঢাকায় মানুষ, তাদের সংলাপ, ইলিয়াসের গল্পে বিশেষ প্রাণ পায়। সাহেবের ট্রাকচালক এই পুরান ঢাকার মানুষ, তার সংলাপেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ট্রাকচালনা শেখানো আর মাছ-গোশতের টুকরে বিনিময়ে সে রমিজ আলীকে নিজের ঘরে শোয়ায়, কিন্তু আকামের সঙ্গী'কে ট্রাকে তার চালকের পবিত্র আসনে বসতে দেয় না। নিরক্ষর রমিজকে সে তার বাবার পাঠানো চিঠি পড়ে শুনায় আর তার বোনকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করে। শ্রেণিগতভাবে সোনামিয়া রমিজ আলীর চেয়ে কিছু ওপরে নয়। রমিজ আর গ্রামের মেয়েদের ব্যবহার করে সে অতৃপ্তি ঘোচায়, আস্ফালনের ভেতর দিয়ে ব্যর্থতাকে ঢাকার চেষ্টা করে। একইভাবে সে বহন করে পবিত্রতা সম্পর্কে অদ্ভুত ধারনা। শহুরে মধ্যবিত্তের মেকি দেশপ্রেম ও সংস্কৃতিচর্চার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে এ গল্পে। যাদের কাছে সমাজসেবা, সমাজ উন্নয়ন লোক দেখানো ভান মাত্র।

শেষ পর্যন্ত ইলিয়াস এ গল্পকে একটা যৌক্তিক পরিণতি দিতে পেরেছেন। সেখানে রমিজ পরাজিত, বন্দী, অসহায়। রমিজকে এই বন্দিত্ব ও অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে লেখক শহরে

আশ্রয় প্রার্থী ভূমিহীন নিম্নশ্রেণির মানুষের অসহায়ত্ব ও বন্দিত্বকে তুলে ধরেছেন। একইসঙ্গে রমিজ আলীর ক্রোধের ভেতর দিয়ে অসহায় মানুষের একটা আত্মজাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন লেখক।

মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এক অসামান্য গল্প *অপঘাত*। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত কয়েকটি ঘটনাকে একটা ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক এ গল্পে। তবে নিছক ঘটনার বিবরণ দেওয়া ইলিয়াসের উদ্দেশ্য নয়, মুক্তিযুদ্ধে মানুষের সীমাহীন আত্মত্যাগের বিবরণও তিনি দিতে চান নি, তিনি ঘটনার চেয়ে ঘটনার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন বেশি এবং ঘটনা কিভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে, কিভাবে মিলিটারির ভয়ে ম্রিয়মান একজন শহীদ মুক্তিযুদ্ধার বাবা সন্তানের কৃতিত্বে নিজেদের বিপদকে অগ্রাহ্য করে হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠে, তা-ই তিনি দেখাতে চেয়েছেন নিজস্ব নিস্পৃহ-নির্মোহ ভঙ্গিতে।

বগুড়া জেলার আওতাধীন একটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলির ছেলে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়। বাড়ির দেড়শ গজের মধ্যে পাকিস্তানি আর্মির ক্যাম্প বসে। ফলে সন্তানের জন্য শোকগ্রস্ত মোবারক বা তার স্ত্রী কাঁদতেও পারে না। কিন্তু চেয়ারম্যানের ছেলে বুলুর বন্ধু 'শাজাহান' জ্বরে ভুগে মরার সময় কেবলি বুলু নাম বলেছে বারবার-এ ঘটনায় ভীত মোবারকের মধ্যে নতুন বোধের জন্ম দেয়। ফলে যে মোবারক আলি একদিন তাঁর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ছেলের কথা চেপে রেখেছিল, তার স্ত্রীকেও কাঁদতে দেয়নি পাছে পাকিস্তানিরা শুনে ফেলে কিনা; সে-ই সন্তানের কৃতিত্বে হঠাৎ গৌরব বোধ করে। সন্তানের সংগ্রাম ও ত্যাগকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং দেড়শ গজের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও সন্তানের যুদ্ধের কৃতিত্ব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করতে শুরু করে। গল্পের শেষের দিকে মোবারকের জন্য স্ত্রীর দুশ্চিন্তা দেখে সে বিরক্ত হয়, ভাবে:

> যার ছেলে মারা গেছে মাস দুয়েকও হয়নি সেই মা অন্য কারণে উতলা হয় কিভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন দু:খে?[২৪]

শহীদ মুক্তিযোদ্ধার ভীত পিতার উপলব্ধির এই রূপান্তর আমাদের বিস্মিত করে।

গ্রামের মানুষের মধ্যে নিরক্ষর চাষা কাবেজ ছাড়া কাউকে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কথা বলতে দেখা যায় না। ভীতি ও অবিশ্বাস এর প্রধান কারণ। তাদের ভাবনার মধ্যেই রয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অবিশ্বাস। নিজের মেধাবী ছেলে শাজাহান যুদ্ধে চলে যাবে বলে চেয়ারম্যান শঙ্কিত, তার প্রশ্ন: 'গাদাবন্দুক আর দাও কুড়াল খন্তা লিয়া মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করবি, অ্যাঁ?' চেয়ারম্যান নিজে পাকিস্তানি আর্মির সাথে ভালো সম্পর্ক রেখে এখানে সাচ্চা মুসলমান ছাড়া কোনো হিন্দু বা মুক্তি নেই-মিলিটারিদের একথা বুঝিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েও নিজের সন্তানের লাশ ক্যাম্পের সামনের রাস্তা দিয়ে গোরস্তানে নিয়ে

যাওয়ার অনুমতি পায়নি। তার স্কলার ছেলে মারা গেছে চিকিৎসাহীন, জ্বরে, মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু বুলুর নাম জপতে জপতে। তার লাশ গোরস্তানে নিয়ে যেতে হয়েছে বাড়ির পেছনের জঙ্গল ও কাদাময় বিলের উপর দিয়ে। এসব করেজের উপলব্ধিতে ধারণ করেছেন লেখক এভাবে:

> শবযাত্রীরা কলেমা শাহাদাত পড়ে, আর কাবেজ হলো জাহেল মানুষ, খোদার কালাম জানে না, সে কেবল জপে যে, বুলুর সঙ্গে তখন শাজাহান যদি চলে যায় তো আজ কি তার এত কষ্ট হয়?[২৫]

শাজাহানের মৃত্যুর পর পাকিস্তানি আর্মির এমনতরো ব্যবহারে সবার মধ্যে যে ভয় জাগে, কাবেজ সে ভয়কে আগ্রাহ্য করে। লেখক দেখাচ্ছেন নিরক্ষর ও পাগলা টাইপের লোক বলেই কাবেজের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। সুস্থ মানুষ প্রাণের ভয়ে ম্লান ও মৃত। এই নিরক্ষর চাষার ভেতর দিয়ে লেখক মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আস্থা ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

নির্দোষ সন্তানের মৃত্যুর বেদনা, মৃত ছেলের মুখ দেখতে না পারার জ্বালা এবং মৃত ছেলের জন্য কাঁদতে না পারার নিদারুণ কষ্ট বুকে নিয়ে জেগে উঠা বুলুর মায়ের এ জিজ্ঞাসা কেবল পড়ে উত্তরহীন। শাজাহানের মৃত্যুতে সে বুক ভরে কাঁদে; এ কান্নার ভেতর দিয়ে মূলত বুলুর জন্য জমে থাকা কান্নাকেই উগরে দেয়। মোবারকের ভাবনায় তা স্পষ্ট হয়, বুলুর জন্য বুলুর মাকে মোবারক কাঁদতে দেয়নি, আজ:

> বৌকে থামাবার কোন ইচ্ছা তার নাই। কাঁদবার এরকম সুযোগ বুলুর মায়ের কতদিন জোটেনি, আবার কবে জোটে কে জানে।[২৬]

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কথাসাহিত্যিকদের নিকটতম ঘটনা বলে এবং গভীর জীবনবোধ, জীবনোপলব্ধি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির অভাবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প লিখতে গেলে সাধারণত তা কোন বিশেষ মাত্রা লাভ করতে পারে না, গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়। ঘটনার অবিশ্বস্ত বিবরণও এর জন্য দায়ী। কিন্তু ইলিয়াস কেবল ঘটনার বিবরণ না দিয়ে ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে গল্পটিকে গতানুগতিকতার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধ এবং এরপর থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মূলত *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* গল্পের পটভূমি। মুক্তিমুদ্ধ থেকে শুরু হয়ে ৯০ দশকের সূচনাকাল স্পর্শ করেছে বলে *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* একটি ভিন্নতর ব্যঞ্জনা পেয়েছে। যুদ্ধের ভেতর কোন ব্যক্তির নতুন চেতনায় উত্তরণ নয়, বরং বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও মহৎ ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন হওয়া একটি দেশে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত কাল পরে কত দ্রুত সর্বস্তরে অবক্ষয় নেমে আসে, আরও পরে কীভাবে তা বিস্তৃতিলাভ করে, প্রতিক্রিয়াশীলরা দ্রুত পুনর্বাসিত ও শক্তিশালী হয়ে কিভাবে চারদিকে ডালপালা শেকড় ছড়িয়ে বসে, তা-ই এ গল্পের মৌল উপজীব্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ত্যাগকে যেমন ইলিয়াস উপলব্ধি করেছেন, তেমনি বরাবরের মত এখানেও দেখেছেন মানুষের শঠতা, স্বার্থপরতা, ক্রূরতা ও পশ্চাৎপদতা।

ইসলামের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে রাজাকাররা, তাদের মতে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু 'কালো হলেও দেখতে ভালো' ইমামুদ্দিনের বউকে কোনো ক্যাম্পে খুঁজে না পেয়ে ইমামুদ্দিনের ভাষায় 'মিলিটারির ভাউরা' রাজাকার নাজির আলি ভাবে:

> আমার দীনের জন্য হাজার মাইল দূর থেকে মিলিটারি এসে জান কোরবান দিচ্ছে, তাদের শরীরে তো কিছু চাহিদা থাকে। সেটুকু মেটাতে না পারলে নিমকহারামি হয়ে যায় না?[২৭]

নাজির আলিদের খোলস এভাবে খুলে যায়, তাদের নিষ্ঠুরতা, আদর্শ-উদ্দেশ্যের অন্ত্যঃসারশূণ্যতা প্রকট ও হাস্যকর হয়ে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ২১ বছরের রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থা কতিপয় মানুষের কর্মকাণ্ড ও ভাবনার মধ্যে উপস্থিত, যার দ্রষ্টা নিরীহ লালমিয়া। যুদ্ধকালের বর্ণনা টানটান; পাঠক মুহূর্তকাল অমনযোগী হওয়ার সুযোগ পায় না। যুদ্ধশেষের পর থেকে বর্তমান অবস্থায় আসতে দীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠার বর্ণনা কিছুটা ক্লান্তিকর। এই বিবরণে নাজির আলির পুনর্বাসনে প্রকারন্তরে এ দেশে স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন ও মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কিন্তু এসব কোন বিশেষ মাত্রা অর্জন করে না। বর্তমান অবস্থায় এসে নাজির আলি যখন প্রস্রাবের বুদবুদে বুলেট ও লালমিয়াকে মিলিয়ে যেতে দেখে, তখন গল্প আবার জমতে শুরু করে।

যুদ্ধের সময় মিলিটারিদের নির্বিচার হত্যা, শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়ার বিবরণ ইলিয়াস উপস্থিত করেন লালমিয়ার ভেতর দিয়ে। এই বর্ণনায় লেখক নিস্পৃহ, ব্যঙ্গপ্রবণ, ঘটনা থেকে ব্যক্তিগতভাবে দূরবর্তী-এসব বিষয় পুরো ঘটনার উপস্থাপনাকে প্রাতিস্বিক করে তুলেছে।

বর্তমানকালের বিবরণে লেখক রূপকের আশ্রয় নেন লালমিয়া এবং তার থেকে বুলেটের মধ্যে সংক্রামিত স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নে একজন মাওলানাকে ঘিরে কিছু মাওলানাকে দেখা যায়, যাদের পায়ের পাতা পেছনের দিকে। স্বপ্নের এই বৃত্তান্ত পড়ে ল্যাটিন আমেরিকার গল্পে 'জাদু বাস্তবতা'র কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু যারা ৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজাকার-মৌলবাদী-প্রতিক্রিয়াশীলদের উত্থান বিষয়ে সচেতন, তাদের মুহূর্তে বুঝতে অসুবিধা হয় না এই পেছনে পা-অলারা কারা। বুলেটের স্বপ্নের মধ্যে, 'লোকটার গায়ের রঙ বুঝা যায় কেবল তার গালে, লালচে ফর্সা রঙ বিকালবেলার আলোতে টকটকে লাল দেখায়।'

বুলেট একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার ছেলে। জন্মের অনতিকাল পরেই মা-বাবা দুজনকে হারিয়ে সে বেড়ে উঠেছে দাদির কাছে, কিন্তু অল্পবিস্তর বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে নিরন্তর সন্তানের বীরত্বপূর্ণ বিবরণ শুনে বিরক্ত লাগত বলে দাদিকে এড়িয়ে চলেছে সে। দাদির

মৃত্যুর পর টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত বহনের চাকরি, লালমিয়ার চা দোকানে চাকরি সব করেছে। চুরি করে জেলেও গেছে। বাস্তবে যেমন, স্বপ্নেও তেমনি বুলেট ব্যঙ্গপ্রবণ ও সন্দেহপ্রবণ। লালমিয়ার ভাষায়, যেমন তার বাবা ইমামুদ্দিন ছিল। লালামিয়ার ধারণা, মিলিটারিকে গ্রেনেড ছুড়ে ইমামুদ্দিন তার লন্ড্রীতে ঢুকে বাঁচার চেষ্টা করে নি লন্ড্রীর মালিক নাজির আলিকে মিলিটারির 'ভাউরা' জেনে পুরানো বন্ধুকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করেছে বলে। বুলেটও তাকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করছে দেখে লালমিয়া ভাবে:'বাপের এই খাসালৎ ব্যাটা পাইল ক্যামনে?' এই ব্যঙ্গপ্রবণ, সন্দেহপ্রবণ ছেলের পক্ষে স্বপ্নের মাওলানাদের এ প্রশ্ন করা অস্বাভাবিক নয় যে-

> আচ্ছা হুজুরেরা, বহুত দিন তো হইয়া গেল, আপনেরা আপনেগো পাওগুলি মেরামত করেন না ক্যালায়?[২৮]

ক্ষুব্ধ হয়ে তারা বুলেটের দিকে এগিয়ে আসতে চাইলেও পায়ের পাতা তাদের নিয়ে যায় পেছনের দিকে। লেখকের উদ্দেশ্য ও তাঁর রূপকের তাৎপর্যের সর্বোচ্চ ব্যঞ্জনা এখানেই দ্যোতিত।

চরিত্রকে চরিত্রের নিজস্ব অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করেন বলে লেখককে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হয়। লালমিয়াকে যুদ্ধে নিতে এসে ইমামুদ্দিন যখন বলে, মিলিটারির হাতে শহীদ কার্তিকবাবুর দোকান দখল করা বের করে দেবে নাজির আলিকে ভিক্টোরিয়া পার্কে নিয়ে গুলি করে, তখন লালমিয়া ভাবনায় পড়ে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। একদিকে মনে হয়: 'সত্যি এই মিলিটারি আর কত সহ্য করা যায়?' আবার এও মনে হতো; 'পাকিস্তানী মিলিটারি হলো দুনিয়ার সেরা ফৌজ, তাদের সঙ্গে লড়াই করে পারবে কে?'

কিন্তু দিগ্বিদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবর আসে, নাজির আলির দুশ্চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা বাড়ে লালমিয়ার। ইমামুদ্দিন এসে নাজির আলিকে শেষ করে দিলে লালমিয়া দোকানের মালিক হয়ে বসবে-এই ভাবনায় স্বস্তি খোঁজে সে। ইমামুদ্দিনকে লন্ড্রিতে কাজ দিয়ে সন্তুষ্ট করার কথা যখন ভাবে, তখন তার স্বার্থচিন্তা লেখকের দৃষ্টি এড়ায় না, ইমামুদ্দিন তখন তার গল্পে বাগরা দেয়র সুযোগ পাবে কোথায়? আরে সে তো তখন লালমিয়ার কর্মচারী, নাকি? লামমিয়া স্বার্থচিন্তা করে, কিন্তু লেখক জানেন, তার এ চিন্তা তার এ প্রবণতাও স্বপ্নের অন্তর্গত, সীমিত। সে শুধু একটা লন্ড্রীর মালিক হতে চায়, আর চায় বিনা বাঁধায় গল্প বলার একটা পরিবেশ। এভাবে ইলিয়াস লালমিয়াদের স্বার্থপরতা, স্বপ্ন ও সীমাবদ্ধতাকে গল্পের ভেতর দিয়ে উপস্থিত করেন।

গল্পের উপান্তে হাউস বিল্ডিংয়ের উঁচু ছাদ থেকে জাফরি কাটা দেয়ালের পাশে দাঁড়ানো স্বপ্নের লোকটির দিকে তীব্র বেগে বুলেটের প্রস্রারের দৃশ্যটি গল্পটিকে একটি ইচ্ছা পূরণের কাহিনীর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়। স্বাধীন দেশে, দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় নগ্নভাবে মগ্ন, লোভী, হঠকারী নাজির আলিদের উত্থান একজন সচেতন লেখককে ভাবিয়ে

তোলে স্বাভাবিকভাবে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন একটি দেশে বর্বর বিরুদ্ধ শক্তির কোন উপযুক্ত বিচার তো হলোই না, উপরন্তু তারাই ক্রমে হয়ে উঠল দেশের চালিকাশক্তি। এই পরিস্থিতিকে প্রকাশ করার জন্য লেখক শুরু করেছেন ২১ বছর আগেকার যুদ্ধের সময় থেকে, তারপর বর্তমানকালে এসে তিনি বক্তৃতা বা প্রতিবেদনের হাত থেকে বাঁচিয়ে গল্পটিকে শিল্পের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাধ্য হয়েছেন রূপকের আশ্রয় নিতে।

পিতা মৌলবি আফাজ আলির পুত্রবিয়োগে মর্মন্তুদ বেদনা ও যন্ত্রণার শিল্পরূপ *কান্না* গল্পটি। আফাজ আলি গোরস্তানের মৃতের জন্য মোনাজাত করে নিজে কাঁদে, সবাইকে কাঁদায়, কিন্তু এই অবস্থাতেও তার ছেলের ব্যাপারে আসা মনু মিঞা যেমন তার দৃষ্টি এড়ায় না, তেমনি মোনাজাতে শামিল ক্রন্দনরত অভিজাত মানুষগুলো মাঝেমধ্যে নিজেদের পকেট ছুঁয়ে দেখতে ভোলে না, 'দিনকাল খারাপ, যেখানে সেখানে পকেটমার, প্রাণ ভরে কাঁদার পথও ভদ্রলোকের বন্ধ হয়ে আসছে।' আফাজ আলী নামাজে দাঁড়িয়ে ইমামের 'আল্লাহ আকবর'-এর চেয়ে গোরস্তানের গেটে গাড়ির শব্দ শুনতেই উৎকর্ণ থাকে বেশি। তাকে নামাজে দাড়িয়ে ভাবতে হয়: লাশের দাফন, জিয়ারত, মোনাজাত ধরতে পারলে কিছু কামাই হয়, তাহলে মনু মিঞাকে দিয়ে বাড়িতে কয়েকটা টাকা পাঠানো যায়।' এভাবে লেখক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে চলমান মানুষের বহিরিস্থিত ও অন্তরিস্থিত প্রবণতা ও ভাবনাগুলো পাঠকের উপলব্ধিতে নিয়ে আসেন । সমাগত শবে বরাতের রাতের পুরো চিত্র আফাজ আলির চিন্তায় চলে আসে, বলা যায় লেখক নিয়ে আাসেন; এতে শুধু জীবিতদের প্রতি নয়, মৃত স্বজনদের প্রতিও জীবিত অভিজাত মানুষদের হঠকারিতা স্পষ্ট হয়। 'মুর্দার সাথে জিন্দার সেদিন মিলনের রাত। মুর্দা প্রিয়জনদের জন্য জিন্দা মানুষের মোহব্বত ছোটে সেদিন নহরের মতো।' আফাজ আলির চেতনায় উপস্থিত মৃতদের প্রতি জীবিতদের এই লোক দেখানো ভালোবাসার প্রতি লেখকের ব্যঙ্গ চাপা থাকে না। কিন্তু বছরের এই দিনটি আফাজ আলির জন্যও টাকা উপার্জনের সুবর্ণ সুযোগ, এই রাতের উপার্জনের জন্য সন্তানের অসুস্থতার খবর শুনেও সে বরিশাল যেতে দ্বিধা করে। বুঝতে পারি, মৃত্যুর পর মৃতদের কবর দিতে এবং তারপর বছরে একদিন শবে বরাতের রাতে যারা গোরস্থানে আসে, তাদের আন্তরিকতা যেখানে ঠুনকো, সেখানে অর্থকষ্টে জর্জরিত আফাজ আলির মোনাজাতও টাকার মূল্যে বিবেচিত হতে বাধ্য। গোরস্থানে দোয়া-দরুদ পাঠ ও জেয়ারতে অভ্যস্ত আফাজ আলি সন্তানের মৃত্যুর খবর শুনে 'ইন্নালিল্লাহ' বলার কথাও ভুলে যায়। গোরস্তানে মৌলবি আফাজ আলির কর্মকাণ্ডের বর্ণনা নিরুত্তাপ, কিন্তু পিতা আফাজ আলির মানসিক অবস্থার বিবরণে লেখকের কলমে তাপ সঞ্চারিত হয়, মানবিক তাপ-

> আফাজ আলি শুধু পায়রার (পায়রা নদী) ঢেউ দেখে। ফাল্গুনের রোদে ঢেউগুলো রোদ পোহায়, এইসব ঢেউয়ের নিচে জলস্রোত উঠানামা করে জলে ডোবা মানুষের লাশের ওপর। নিচে কী হলো যে কবরগুলো এভাবে কাঁপে। ওখানে কি গোর আজাব হচ্ছে?[২৯]

আফাজ আলির নীল বেদনা নদীর জলস্রোত ও ঢেউয়ের প্রতীকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পুত্রের জন্য পিতার বেদনা নিয়ে দীর্ঘ সময় নষ্ট করবেন তেমন লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নন- এসব অল্প কথায় ছড়িয়ে দিয়ে তিনি চলে যান বস্তুজগতে, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ সতত ব্যস্ত বেঁচে থাকার সংগ্রাম আর নিদারুণ হঠকারিতায়। যে গোরস্তানে মৃতের পরকালীন শান্তি কল্যাণ কামনার নামে মৃতের স্বজন এবং মাওলানা ও গোরস্তানের গোরকোন-কাম-মালির ব্যবসা চলে, টাকার বিনিময়ে কবরের পরিচর্যা এবং মোনাজাতে দাড়িয়ে মৃত স্বজনের জন্য কান্নার অভিনয় চলে, সে গোরস্তানে মরে লাশ হয়ে আসতে বা লাশের স্বজন হয়ে আসতে যে কেউ পারে না। এমন এক গোরস্তানের মুখোমুখি ইলিয়াস আমাদের দাঁড় করান যেখানে মৃত লাশও তার জীবনকালের আভিজাত্য বজায় রাখে। এক কলেজ মাস্টারের উপর আফাজ আলির ক্ষোভের ভেতর দিয়ে লেখক জানাচ্ছেন:

> কোন এক কলেজ মাস্টার, এই গোরস্তানে ওই সব মানুষকে পোছে কে? মুর্দা হোক আর জিন্দা হোক, এখানে আসে সব বড় বড় মার্চেন্ট, ফরেনারদের অফিসে কাজ করা সায়েবরা এখানে আসে, এই কাঁচাপাকা চুলকে এখানে গুণতির মধ্যে ধরা যায়? মরহুম শ্বশুরের জন্য তবু এখন আসতে পারো, মরলে তোমার লাশ ঢুকতে পারবে এখানে?[৩০]

কিন্তু এই আফাজ আলির জায়গাও মৃত্যুর পর কি এই গোরাস্তানে হবে? এর উত্তর এই গল্পের অন্যত্র রয়েছে। আফাজ আলির ছেলেকে যে গেরাস্তানে দাফন করা হয়েছে তার অবস্থা ভয়াবহ, সেখানে পায়খানার গন্ধ, রাতে 'শেয়ালের খোঁড়া কবরগুলো থেকে উঁকি দেয়া' মুর্দাদের খুচরা-খাচরা ঠ্যাং, রান বা হাঁটুর গন্ধে আফাজ আলির পক্ষে মোনাজাত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বুঝতে পারি, যে গোরস্তান আফাজ আলি জীবন কাটায়, মৃত্যুর পর কলেজ মাস্টার কেন আফাজ আলির জায়াগাও হবে না সেখানে।

কান্না গল্পে আফাজ আলিকে সন্তানের মৃত্যুতে কাঁদতে দেখা যায় না, সে তাৎক্ষণিকভাবে দোয়া দরুদ পাঠ করতে পর্যন্ত ভুলে যায়। পরে সে যে গোরস্থানে কবর জেয়ারত করায়, লাশ দাফনের পর মোনাজাত ধরে টাকার বিনিময়ে, সেখানে এসে, 'শাহতাব কবির' নামে এক মৃত যুবকের জন্য মোনজাতে কাঁদতে গিয়ে মূলত নিজের সদ্য মৃত সন্তান হাবিবুল্লার জন্যই নিজের অসহায়ত্ব ও বেদনাকে ছড়িয়ে দেয়। এ দৃশ্যকে বাস্তবসম্মত ও বর্ণনাকে প্রাঞ্জল করার জন্য ইলিয়াস অবশ্য ব্যবহার করেন গোরকান শরীফ মৃধাকে। 'আল্লা, তার নাদান বাপটার কথা একবার তুমি ভাবিয়া দেখলা না?' আফাজ আলি মোনাজাতে এ কথা বলার পরে আমরা দেখি তার 'গেরাইম্যা লবজের' প্রয়োগে শরীফ মৃধা উদ্বিগ্ন, তার ভাবনা, মোনাজাতে হুজুরের জবান সমসময় খুব চোস্ত। কিন্তু এখানে এই 'গেরাইম্যা লবজে'ই আল্লাকে ডাকতে ডাকতে আফাজ আলি যখন প্রশ্ন তোলে, 'আল্লা, তার নানাদ বাপটা কি খালি গোর জিয়ারত করার জন্যই দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকবো?' তখন, এই এক বাক্যেই অন্যের জন্য মোনাজাতকারী আফাজ আলি মৃত হাবিবুল্লার পিতায় রূপান্তরিত হয়। তার

সন্তান হারানোর কষ্ট, স্ত্রী-পুত্র ফেলে ঢাকা গোরস্তানে পড়ে থাকার দুঃখ আর বিরতিহীন নি:সঙ্গতা ওই অন্ধকারাচ্ছন্ন কবরের ভয়াবহতার চেয়েও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ঢাকাকে কেন্দ্র করে এক অসামন্য সাহসী গল্প *রেইনকোট*। এই গল্পের শুরুতে ভীত সন্ত্রস্ত কেমিস্ট্রির লেকচারার নূরুল হুদার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুকে রেইনকোট গায়ে দেবার পর সঞ্চারিত হয় অপরিমেয় উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম। গল্পে এই রেইনকোটের প্রতীকী তাৎপর্য অসাধারণ।

নুরুল হুদা মিলিটারির ভয়ে মুক্তিযুদ্ধ এবং যোদ্ধাদের প্রসঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, এসব বিষয়ে ভাবতেও ভয় করে। শ্যালক মিন্টু তার বাসা থেকেই মুক্তিমুদ্ধে গেছে-এ তথ্য আড়াল করার জন্য ঢাকা শহরে সে চারবার বাসা বদল করেছে। ঢাকা কলেজের সামনে গেরিলা আক্রমণ করে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস করে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। তারই অনতিদূরে অবস্থিত পাকিস্তানিদের ক্যাম্প। ঘটনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কলেজের শিক্ষকদের তলব করে এবং তাদের মধ্যে থেকে নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করে। পাকিস্তানি মিলিটারি নুরুল হুদাকে জানায় যে, মুক্তিযোদ্ধারা কুলির বেশে ঢুকেছিল এবং তাদেরকে সে চেনে, এমনকি সে তাদের গ্যাঙের একজন সদস্য। এ ধরনের প্রশ্নের আকস্মিকতায় নুরুল হুদা আরো উৎসাহিত হয়। মিন্টুর মত মুক্তিযোদ্ধাদের পাহাড়সম সাহস তার মধ্যে ভর করে। সে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধাদের একজন ভাবতে শুরু করে। গল্পে ফ্ল্যাশব্যাকে আমরা দেখি, কলেজের জন্য যে দশটি আলমিরা কেনা হয়েছে, তার দায়িত্ব ছিল সেগুলোর মান পরীক্ষা করা। এগুলো যেসব কুলি বয়ে এনেছে, তাদের মধ্যেই ছদ্মবেশে ছিল মুক্তিযোদ্ধা, তারাই মিলিটারি ক্যাম্পের পাশের ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ধরা পড়েছে এবং মিলিটারির অভিযোগ সে নূরুল হুদার নাম বলেছে, তার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যোগাযোগ আছে বলে উল্লেখ করেছে। মিলিটারির যাবতীয় প্রশ্নের জবাব সে ঠিকই দিচ্ছিল, কিন্তু যখন জানল, কুলিবেশী মুক্তিযোদ্ধা বলেছে, নুরুল হুদা তাদের গ্যাঙের একজন নিয়মিত সদস্য, তখন সে গৌরব বোধ করে, তার চেতনার রূপান্তর ঘটে, তার নবজন্ম হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের আস্তানা নুরুল হুদা চেনে কিনা-মিলিটরির এ কথার উত্তরে সে বলে-হ্যাঁ। কিছুই না জানা সত্ত্বেও এই 'হ্যাঁ' জবাবের মধ্যে দিয়ে সে নিজেই একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হয়। মিলিটারির সামনে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার যে বিপদের আশঙ্কা, তাকে সে আবলীলায় অগ্রাহ্য করে। কল্পিত আস্তানার খবর তার কাছ থেকে বের করতে না পেরে মিলিটারিরা তাকে ছাদের আংটার সাথে ঝুলিয়ে যখন তার পাছায় নিরন্তর চাবুক মারে, তখন এই আঘাতকে তার স্রেফ উৎপাত মনে হয়। কারণ, আগের সেই ভীত কেমেষ্ট্রির লেকচারার থেকে তার মধ্যে রূপান্তর ঘটে এক অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা সত্তায়। বৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোট গায়ে চাপানোর পর থেকেই তার এ রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাকিস্তানি মিলিটারিয়া যখন তার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে

আংটার সাথে ঝুলিয়ে চাবুক মারে, তখন চাবুকের আঘাতকে তার মনে হয়- যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের উপর।

মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর আর্মি যে নিপীড়ন চালায়, মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও সে এই আঘাতকে গ্রহণ করে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সম্মানে অভিষিক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে চেনে এবং তার উপর আস্থাও তাদের কম নয় -এই আনন্দ ও গৌরব সে নিরন্তর বলে চলে ' মিসক্রিয়ান্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই, সে ছদ্মবেশী কুলীদের আস্তানাও চেনে।'

ছদ্মবেশী কুলিদের যে আস্তানা সে চেনে, আমরা বুঝতে পারি, তার নাম বাংলাদেশ- যেখানে সব স্তরের, সব শ্রেণির মানুষ মাটির জন্য লড়াই করছে। রেইনকোটের প্রতীক মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এক অনবদ্য ব্যাঞ্জনাময় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এ গল্পে।

তথ্যসূচি:

---

১ শওকত আলী প্রণীত 'মীথ, তৃণমূলে যাবার এক পথ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, (জনান্তিক, ঢাকা: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস' সংখ্যা, অক্টোবর ২০০২), পৃ. ১২

২ ছোটগল্প তো তার জন্মলগ্ন থেকেই বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির রোগ ও ক্ষয়কে তীক্ষ্ণভাবে নির্ণয় করে আসছে। (আখতারুজ্জামানের 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' প্রবন্ধের 'বাংলা ছোটগল্পে কি মরে যাচ্ছে?' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩), পৃ. ৭১

৩ ভোটের রাজনীতিতে দরকার পোস্টার, বিপ্লবের জন্য চাই সাহিত্য। (আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরি, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: শাহাদুজ্জামান, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ৯৬

৪ ফ্রয়েড মনের উদ্দেশ্যগুলোর উৎসকে তিনিটি স্তরে ভাগ করেছেন-অদস (Id) অহং (Ego) এবং অধিশাস্তা (Super-ego) । আসলে অহং এবং অধিশাস্তা অদস-স্তর থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে। বাস্তব পরিস্থিতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরবর্তী কালে অদস-এর কিছু অংশেই অহং এবং অধিশাস্তাতে পরিণত হয়। ফ্রয়েড বলেছেন: 'অহং শেষ পর্যন্ত অদসেরই একটি অংশ, বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিবন্ধকের মুখে অদসের এক উদ্দেশ্যমূলক পরিণত অংশ।
অদস - এর মধ্যে মূল্যবোধ বা ভালোমন্দ বলে কোন জিনিস নাই। অদস নীতি বোঝা না। অদস -এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সুখভোগ। এই সুখনীতির (Pleasure Principle) দ্বারা অদস-এর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত হয়। (ফ্রয়েড, সুনীল কুমার সরকার, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮০), পৃ. ২৪-২৫

৫ আমি Sex এর পেছনে Living মানে Class কে দেখতে চাই, Society কে দেখতে চাই।
(আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: শাহাদুজ্জামান: লিরিক, সংখ্যা আট , বাতিঘর, চট্টগ্রাম: ১৩৯২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৬০

৬ ধমনি: গালি সংখ্যা, সম্পাদক-আবদুল মান্নান স্বপন, (৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কিশোরগঞ্জ: ফেব্রুয়ারি ২০১২) পৃ. ৭৭

৭ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'তারাবিবির মরদপোলা', *রচনাসমগ্র* ১ , (৭ম মুদ্রণ; ঢাকা : মাওলা ব্রাদাস, ২০১২), পৃ. ১৮৭

৮ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'ফেরারী', *রচনাসমগ্র* ১, পৃ. ৭২

৯ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'উৎসব', *রচনাসমগ্র* ১, পৃ. ৩১

১০ সমাজের প্রবল ভাংচুর, সমাজব্যবস্থায় নতুন নতুন শক্তি ও উপাদানের সংযোগ প্রভৃতির ফলে মানুষের গভীর ভেতরের রদবদলের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত ছোটগল্পের শরীরেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য।

'ছোট প্রাণ, ছোট কথা' বলে এখন কিছু আছে কি? 'ছোট দুঃখ' কোনটি? প্রতিটি ছোট দুঃখের ভেতর চোখ দিলে দেখা যায় তার মস্ত প্রেক্ষাপট, তার জটিল চেহারা এবং তার কুটিল উৎস। ছোটগল্পের হৃৎপিণ্ডে যে-প্রবল ধাক্কা আসছে তা থেকে তার শরীর কী রেহাই পাবে?

(আখতারুজ্জামানের 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' প্রবন্ধের 'বাংলা ছোটগল্পে কি মরে যাচ্ছে?' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩),পৃ. ৭৬

১১ সত্যিই মৃত্যুটা আমাকে খুব হন্ট করে। গল্পে এভাবে যে মৃত্যু এসেছে তার কারণ হতে পারে আমার খুব নিকটজনদের মৃত্যুর যে শোক বা ভয় তার জন্য ভেতর ভেতর Prepare হচ্ছি এ গল্পেগুলি লিখে। এটাকে একধরনের Psyschological Preparation for death বলতে পারো। মৃত্যু নিয়ে লিখে আমি হয়তো মৃত্যুর ভয় কাটাতে চেষ্টা করছি, সাহস সঞ্চয় করছি। (আখতারুজ্জামান ইলয়াসের সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা: শাহাদুজ্জামান: লিরিক, সম্পাদক-এজাজ ইউসুফী, সংখ্যা আট, বাতিঘর, চট্টগ্রাম: ১৩৯২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৬০

১২ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *ফেরারী*, *রচনাসমগ্র* ১, পৃ. ৭৩

১৩ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*, *রচনাসমগ্র* ১, পৃ. ৩৫৩

১৪ জাফর আহমদ রাশেদ: আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্কারণ, ঢাকা: ২০১২

১৫ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *অন্য ঘরে অন্য স্বর*, *রচনাসমগ্র* ১, পৃ. ৮৫

১৬ *তদেব*, পৃ. ৮৫

১৭ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *দুধ ভাতে উৎপাত*, *রচনাসমগ্র* ১, পৃ. ১৮৫

১৮ *তদেব*, পৃ. ১৮৯

১৯ *তদেব*, পৃ. ১৯২

২০ *তদেব*, পৃ. ১৯৫

২১ *তদেব*, পৃ. ১৯৫

২২ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *পায়ের নিচে জল*, *রচনাসমগ্র* ১, পৃ. ২১২

২৩ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *কীটনাশকের কীর্তি*, *রচনাসমগ্র* ১, পৃ. ২৪৩

২৪ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *অপঘাত*, *রচনাসমগ্র* ১, পৃ. ২৯২

২৫ *তদেব*, পৃ. ২৮৯

২৬ *তদেব*, পৃ. ২৭৯

২৭ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*, *রচনাসমগ্র* ১, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪

২৮ *তদেব*, পৃ. ৩৭৪

২৯ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *কান্না*, *রচনাসমগ্র* ১, পৃ. ৩৮৬

৩০ *তদেব*, পৃ. ৩৮১।